রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে'। ধারা বহমান; আমরা বলি, অঝোরধারায় বৃষ্টি, হাসি, আনন্দ, কান্না। ধারা বহন করে আশা, কখনো দুঃখ, বেদনা। এই যে ধারাগুলোর কথা বলা হলো, সেগুলো অদৃশ্যধারা। আমরা খালি চোখে এগুলো দেখতে পাই না। না দেখলেও আমরা এই ধারায় প্রচন্ডভাবে প্রভাবিত হই, আনন্দধারায় উল্লসিত হই, প্রেমের ধারায় সিক্ত হই, বেদনা ধারায় আহত হই। আধুনিক যুগে জ্ঞানের ধারার অনেক বিকাশ ঘটেছে, প্রযুক্তির নতুন উদ্ভাবন ও যোগাযোগের ঘনিষ্ঠতার কারণে জ্ঞানের ধারায় প্রবাহ বৃদ্ধি পাচ্ছে, নবীন মানুষ ও জাতি সমৃদ্ধ হচ্ছে।

ধারা বা প্রবাহকে কি আটকে দেয়া যায়? দৃশ্যমান ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, আমরা জানি নদীর উপর আড়াআড়ি ভাবে বাঁধ দিয়ে আধুনিক মানুষ জলপ্রবাহকে আটকে দিতে পারে। দৃশ্যমান ধারার মতো, অদৃশ্য ধারাকেও আটকে দেয়ার উদাহরণ ও রয়েছে। যেমন জ্ঞানের ধারায় বাঁধ দিয়েছিলো প্রাচীন ভারতের বৈদিক সমাজ। অস্পৃশ্য জাতি ও নারীর জন্যে 'বেদ বাক্য' পঠন ও শ্রবণ উভয়ই অমোচনীয় পাপ বলে বিধান দেয়া হয়েছিলো। প্রাচীন বৈদিক সমাজের এই চিন্তা ও কর্মের পেছনে যে দর্শন ছিলো, দুঃখজনক ভাবে আজো তার অস্তিত্ব বিরাজমান। পৃথিবীতে বাঁধ বাধার বুদ্ধি সর্বপ্রথম আবিষ্কার করে মন্দির কেন্দ্রিক পুরোহিত-চালিত বৈদিক সভ্যতা। প্রথমে জ্ঞান চর্চায় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। ফলশ্রুতিতে, মানুষ তার মুক্তচিন্তার ক্ষমতা হারায়। বুদ্বির একটি বিশেষ মাত্রা হলো চিন্তায় যুক্তির ব্যবহার ও সে থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা। মানুষ যুক্তি ব্যবহারে সক্ষম হয়, যদি সে জ্ঞান প্রবাহে সম্পৃক্ত থাকে। প্রাচীন ভারতের পুরোহিত সমাজ এই প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে, অতঃপর মানুষের চিন্তা ও কর্ম দুটোকেই প্রভাবিত করতে শুরু করে। দৃষ্টান্ত হচ্ছে শ্রমবিভাগ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশ। মানুষের চিন্তা ও সৃজনশীলতাকে কেবলমাত্র সীমিত পরিসরে আটকে রাখার জন্যে এটিও এক ধরণের বাঁধ। সমাজের উৎপাদন 'প্রক্রিয়া' ও উৎপাদিত পণ্যের 'প্রবাহ' দুটোই পুরোহিত নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থার অধীনে চলে যায়। মানুষের পেশা, আচার-আচরণ, উৎসব, সংস্কৃতি, প্রকৃতপক্ষে সামগ্রীক জীবন-প্রবাহের উপর এই নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয়। এই নিয়ন্ত্রণের প্রধান কেন্দ্র ছিলো মন্দিরগুলো- যা ক্রমান্বয়ে পুরো সমাজ ব্যবস্থার কেন্দ্রে পরিণত হয়। মধ্যযুগে ইউরোপেও আমরা দেখি জে, রাষ্ট্রের প্রায় সমান্তরাল ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে চার্চ। মানুষের চিন্তা, কর্ম ও জ্ঞানের ধারার উপর সেখানেও নিয়ন্ত্রণ আরোপের চেষ্টা চলে, এবং চার্চ এক্ষেত্রে সফলও হয়েছিলো। কিন্তু মানুষের স্বভাব ই হলো অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। সে নিয়মেই হয়তো ইউরোপরে রেঁনেসা ঘটেছে, মানুষের চিন্তা, যুক্তি ও কর্মে স্বাধীনতা এসেছে।

দূর্ভাগ্য, ভারতবর্ষে কোন রেঁনেসা ঘটেনি। এখনো পর্যন্ত ভারত সরকারকে নিম্নবর্গের জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্যে কমিশন গঠন করতে হয়। অস্পৃশ্যতার অভিশাপ নিয়ে প্রতিদিন হাজার শিশু জন্ম নেয় এবং হাজার মানুষ অস্পৃশ্য অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করে। মানুষের চিন্তা-চেতনার উপরে যে বাঁধ দেয়া হয়েছিলো, তা কি এখনো বিরাজমান? বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও, অবস্থাদৃষ্টে প্রশ্নটি মনে আসে।

মন্দির কেন্দ্রিক পুরোহিত-ব্যবস্থা অদৃশ্য বাঁধ দেয়াতে সফল হবার পর শুরু করে দৃশ্যমান ধারা সমূহের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের। প্রাচীন ভারতে সর্বপ্রথম দৃশ্যমান বাঁধ নির্মিত হয় সম্ভবত খৃষ্টপূর্ব ১৯০০ অব্দে। সাম্প্রতিক সময়ে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ধারণা করছেন, সিন্ধু সভ্যতা'র পেছনে সে সময়ে প্রবহমান 'সরস্বতী' নদীর ব্যাপক অবদান ছিলো। আরো ধারণা করা হয় যে, হরপ্পা নগরীর পতনের মূল কারণ ছিলো, ব্যাপক সংখ্যাক দরিদ্র-উদ্বাস্তের নগরীতে আগমন ও তদ্বজনীত সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা। মনে রাখতে হবে যে, সরস্বতী নদীর জল-প্রবাহের গতি পরিবর্তন করেই নগরীর জল-সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছিলো। ধারণা করা হয়, পরবর্তীতে ব্যাপকা আকারে নগরী সংলগ্ন কৃষিকাজে সরস্বতী'র পানি ব্যবহার শুরু হয়। সম্ভবতঃ পরবর্তী কয়েক দশকে সরস্বতী নদীটি শুকিয়ে যায়, ফলতঃ এর অববাহিকা জুড়ে অনাহার, দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ হরপ্পা নগরী আক্রমন করে ও এর পতন ঘটে।

মন্দির-কেন্দ্রিক পুরোহিত সমাজ দেখলেন, চিন্তা ও জ্ঞানের ধারায় বাঁধ সৃষ্টি করে যেমন মানুষকে বোঝানো যায়, 'জাত হচ্ছে তার পূর্ব জন্মের কর্মফল', তেমনি নদীর ধারায় দৃশ্যমান বাঁধ দিয়ে, বন্যা ও খরা সৃষ্টি করে মানুষকে ভাগ্য, পাপের ফল, ঈশ্বরের অভিশাপ.. ইত্যাদিতে বিশ্বাসী অর্থাৎ অদৃষ্টবাদী করে তোলা যায়। প্রাচীন ভারতের মন্দির কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবি বা Think Tank, (ভারতীয় পুরাণে মানস সরোবর বলতে এই শ্রেণীটিকেই বোঝানো হয়েছে) এই নীতির স্বার্থক প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। দূর্ভাগ্যজনক যে, মানুষকে নির্ভরশীল করে রাখার এই নীতি'র (দূর্নীতি?) প্রয়োগ দেখতে পাই এখনো। ভারত চাইছে, আমাদের নদী, নদীর জল-প্রবাহ ভারতের উপর নির্ভরশীল থাকুক।

অথচ, নদীরা আমাদের অস্তিত্বে বিরাজমান। জাতীয়তাবাদের উত্থানপর্বে একটি শ্লোগানের কথা আমরা বলতে পারি। পৃথিবীর আর কোন জাতি নদীর পরিচয়ে নিজেকে আবিষ্কার করেনি, যেমনটি আমরা করেছি। আমরা বলেছিলাম, 'পদ্মা মেঘনা যমুনা/তোমার আমার ঠিকানা'। নদীর সাথে আমাদের দৃশ্যমান ও অদৃশ্য উভয় ধরণের বন্ধন বিদ্যমান। আমাদের নদীগুলো 'রমণীর' মতো, নদীও জীবন্ত হয়ে ওঠে, জনপদের সাথে নিত্য কথা বলে। পৃথিবীর আর কোথাও নদীর এমন কাব্যিক নাম খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। যেন আমাদের মননশীলতার সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে এই নামগুলোতে। সুন্দরবনে একটি নদী আছে নাম সন্ধ্যা, আছে তেতুলিয়া, বাঙালী, দুধকুমার, তিতাস, রূপসা, মেঘনা। নদীর সাথে এই যোগাযোগ আমাদের অস্তিত্বকে ধারণ করে আছে। সঙ্গীতে, সাহিত্যে, চিত্রকলায়, চলচ্চিত্রে, কবিতায় নদীর প্রভাব অপরিমেয়। নদীগুলো যেমন আমাদের অগ্রগতি,পশ্চাৎগতি, নৈতিকতা, অনৈতিকতার প্রতিচ্ছবি ধারণ করে। বাংলাদেশের অনেক নদী মরে যাচ্ছে, প্রবীনেরা বলেন, দেশটি ক্রমশঃ রসাতলে যাচ্ছে। রাজধানী হবার কারণেই সম্ভবতঃ ঢাকা নগরীতে দৈনন্দিন দুর্নীতির হার বেশী। সমান্তরালে, বুড়িগঙ্গা নদীর দূষণ চরম মাত্রায় পৌঁছেছে। আমরা জানি এই পরিস্থিতিগুলোর পেছনে অনেক কারণ রয়েছে, তথাপি কী অদ্ভূত ভাবেই না নদীরা আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরছে। আমাদের নদীরা জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে বিরাজিত। আমরা বলি আকাশ-গঙ্গা; রূপকথার পাতাল পুরীতে রয়েছে সাত সমুদ্র তের নদী। ভারতবর্ষের প্রাণের সন্জীবনী-ধারা এই নদীগুলোর অস্তিত্ব আজ সংকটের সম্মুখীন।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে অর্ধ শতাধিক অভিন্ন নদী প্রবাহিত হচ্ছে। বড় তিনটি নদীর উৎস উত্তর-পূর্ব ভারতের হিমালয় উপত্যকায়। এই নদীগুলোর সাথে দুটো দেশের বিপুল সংখ্যাক মানুষের জীবিকা ও আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন প্রবলভাবে জড়িত। ভারতীয় রাষ্ট্রযন্ত্র কতৃক উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বৈদিক নদী দর্শন-বিদ্যা চর্চার ফলে দুটো দেশেরই ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। বিশেষতঃ ভাটির দেশ হিসেবে বাংলাদেশে ক্ষতির পরিমাণ অধিক। শুধুমাত্র ফারাক্কার কারণে আমাদের কৃষিতে বার্ষিক ক্ষতির পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকা। সিলটের সুরমা ও কুশিয়ারা'র মূল নদী 'বরাকের' উপর টিপাইমুখে ভারত বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা নিচ্ছে। আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ভারত হয়তো ব্রহ্মপুত্র নদী থেকে এক তরফা ভাবে পানি প্রত্যাহার করবে। ব্রাহ্মণ্যবাদী নদী দর্শনে প্রভাবিত ভারতের রাষ্ট্রযন্ত্র অত্যন্ত দক্ষতার সাথে প্রাচীন ধ্যান-ধারণা চর্চা করছে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকে সমগ্র ভারতে এ পর্যনন্ত সাড়ে তিন হাজারের ও অধিক বাঁধ নির্মিত হয়েছে। পৃথিবীতে ভারতের অবস্থান সেদিক থেকে ২য়। বাস্তবিক তথ্য হচ্ছে, ব্রাহ্মণ্যবাদী নদী-দর্শনের প্রায়োগিক ফল যা মূলতঃ শ্রেণীচরিত্রের নির্ভেজাল বহিঃপ্রকাশ সেটি লক্ষাধিক মানুষের জন্য চরম বিপর্যয় ডেকে আনছে। ধরে নেয়া যাক ক্ষুদ্র প্রতিবেশী বাংলাদেশের পরিবেশ, অর্থনৈতিক ক্ষয়-ক্ষতি নিয়ে ভারতীয় সরকার ভাবিত নয়। (যদিও এমনটি ভাবর কোন যৌক্তিক ও নৈতিক কারন নেই) কিন্তু ভারতের অভ্যন্তরে এই দর্শন-চর্চার অভিঘাত কি? সুপ্রিয় পাঠক, চলুন সে প্রশ্নের উত্তর খোঁজা যাক।

আমরা 'নর্মদা উপত্যকা উন্নয়ন প্রকল্পে'র (Narmada Valley Development Project) কথা বলতে পারি। স্বাধীন ভারতে এ পর্যন্ত নেয়া পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পগুলোর মধ্যে এটাই বৃহত্তম। বিগত প্রায় দু-দশক ধরে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

নর্মদা নদী উত্তর পশ্চিম ভারতের অন্যতম দীর্ঘ নদী। মধ্যপ্রদেশের অমরকন্টক উপত্যকায় উৎপন্ন হয়ে প্রায় ১৩০০ কি.মি. দীর্ঘ নদীটি মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আরব সাগরে পতিত হয়েছে। ১৯৬৫ সালে ভারতের খোসলা কমিশন আরব সাগরের মোহনার ৩৫০ কি.মি. পূর্বে ৫৩০ ফিট উচ্চতা বিশিষ্ট বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা করে। একাধিক রাজ্যের স্বার্থসংশ্লিষ্ট দাবীর মুখে বিষয়টি তৎকালে ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দেয়। সে প্রেক্ষিতে ভারত সরকার ১৯৬৯ সালে Narmada Water Dispute Tribunal (NWDT) গঠন করে। দীর্ঘ ১০ বৎসর একাধিক পক্ষের দাবী ও যৌক্তিক বিষয়াদি বিবেচনার পর ১৯৭৯ সালে NWDT একটি সমঝোতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রণয়নে সক্ষম হয়। ভারত সরকার যদিও এই প্রকল্পকে একটি বহুমুখী ও উৎপাদনশীল প্রকল্প বলে দাবী করছিলো, কিন্তু হঠকারী, সামজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্যের প্রতি হুমকি হয়ে ওঠা এই বিশাল ধ্বংসযজ্ঞের বিরুদ্ধে পরিবেশবাদী গ্রুপ প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। বিষয়টি আদালতে গড়ায়, কিন্তু ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টে ২০০১ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্পের সমর্থনে চূড়ান্ত রায় দেয়। সুপ্রীমকোর্ট অবশ্য ঐ রায়ে সুস্পষ্টভাবে ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসন ও প্রত্যেক পর্যায়ে Environmental Clearance (EC) নেয়ার নির্দেশ দেয়। (এই শর্তগুলোর কোনটিই পরিপূর্ণভাবে বাস্তবের মুখ দেখেনি) উচ্চাভিলাষী এই প্রকল্পে রয়েছে ৩০ টি বৃহৎ, ১৩৫ টি মাঝারী ও প্রায় ৩০০০ টি ক্ষুদ্রাকৃতির বাঁধ। তার সাথে বিস্তৃত থাকবে কয়েক হাজার কি.মি. দীর্ঘ Canal Network (খাল)। এ পর্যন্ত ০৬টি বৃহৎ বাঁধ নির্মিত হয়েছে, একাধিক বৃহৎ বাঁধের নির্মাণ কাজ চলছে। Narmada Control Authority (NCA) এর হিসাব অনুযায়ী এই প্রকল্প সমাপ্ত হলে মরু অঞ্চলের প্রায় ৩ কোটি মানুষের কাছে সুপেয় পানি পৌছানো যাবে, সম্প্রসারিত সেচ সুবিধার ফলে অতিরিক্ত ২ কোটি মানুষের জন্যে খাদ্যশষ্য উৎপাদন সম্ভব হবে।

ইতিবাচক অনেক উপযোগীতার কথা বলা হলেও, কার্যতঃ এই নর্মদা প্রকল্প একটি হঠকারী পদক্ষেপ মাত্র যা পরিবেশগত বিশাল বিপর্যয় ব্যতীত আর কিছুই বয়ে আনবে না। আমরা এখানে দুটো বৃহৎ বাঁধের কথা তুলে ধরবো, যার প্রেক্ষিতে এই কল্যাণমুখী(?) প্রকল্পের Impact বোঝা সম্ভব হবে।

এক।। সর্দার সরোবর প্রজেক্ট (Sardar Sarovar Project, SSP) হচ্ছে নর্মদা প্রকল্পের বৃহত্তম বাঁধ। গুজরাটের নব্গামে অবস্থিত ১৩৮.৬৮ মি। উচ্চতা বিশিষ্ট বাঁধটি নির্মিত হলে ২১৪ কি.মি. দীর্ঘ জলাধার (Reservoir) তৈরী হবে। বহুমুখী এই প্রকল্প একযোগে বাস্তবায়ন করছে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ , রাজস্থান ও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার, যা সমাপ্ত হলে ৫ মিলিয়ন একর জমি সেচের আওতায় আসবে, উৎপাদিত হবে ১৪৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ।

সমগ্র নর্মদা প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে নর্মদা নদী বলে আর কিছু থাকবে না। যা অবশিষ্ট থাকবে তা হলো অনেকগুলো হ্রদের সমন্বয়ে একটি খন্ডিত নদী। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, SSP দীর্ঘমেয়াদী পরিবেশ বিপর্যয়ের সৃষ্টি করবে। ৪৫০ ফিট উচ্চতার এই বাঁধ নির্মিত হলে পারিপার্শ্বিক ৪১,০০০ হেক্টর কৃষিজ ভূমি স্থায়ীভাবে জলমগ্ন হবে। প্রান্তিক ভাবে (প্রধানতঃ মৌসুমী বায়ূজনিত বর্ষার সময়) জলমগ্ন হবে আরো ৫০,০০০ হেক্টর জমি। সবচেয়ে ভয়াবহ যা ব্যাপার তা হলো, এই বাঁধ নির্মাণের ফলে উদ্বাস্তু হবে প্রায় দু লাখ মানুষ। মধ্যপ্রদেশের ১৯৩টি, মহারাষ্ট্রের ৩৩ টি, এবং গুজরাটের ১৯টি গ্রাম সম্পূর্ণরূপে পানিতে তলিয়ে যাবে। এই

হিসেব দিচ্ছে NCA, উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের সংযোগ খাল, রেগুলেটর ইত্যাদি নির্মানের জন্যে ব্যবহৃত ভূমি এই হিসেবে অন্তর্ভূক্ত নয়। নিমজ্জিত ভূমির প্রায় ৩৩% হচ্ছে মাঝারী আকারের বনভূমি। হুমকির সম্মুখীন বনজ ও বন্য প্রাণীর মূল্য ও এতে অন্তর্ভূক্ত নয়। নদী বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন যে, বাঁধ দিয়ে নদীর গতি পথ নিয়ন্ত্রণের সুদূরপ্রসারী ফল তেমন একটা লাভজনক হয় না। ক্ষেত্রবিশেষে, আসলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণ ই বেশী দাড়ায়। SSP'এর ক্ষেত্রেও এরূপ আশংকা রয়েছে। বিস্তীর্ন জলমগ্নতার কথা ইতিমধ্যে ই উল্লেখ করেছি। নদী থেকে কৃত্রিম ভাবে সৃষ্ট হ্রদে, দীর্ঘ সময়ব্যাপী তৈরী হওয়া ইকোসিষ্টেম ভেঙ্গে পড়ে। জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়, মাটির গুণাগুন (কাঠামোগত ও উপাদানগত উভয়ই) ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

প্রাকৃতিক পরিবেশের পাশাপাশি সামাজিক পরিবেশেও দীর্ঘমেয়াদী ঋণাত্মক প্রভাব পড়বে। ইতিমধ্যে ই SSP'র কারণে অর্ধলক্ষাধিক মানুষ বাস্তুহারা হয়েছে। প্রকল্প সমাপ্ত হলে এই সংখ্যা দাড়াবে ২.৫-৩ লক্ষে (১৯৮১ সালের হিসেব) এইসব গ্রামীণ মানুষ, যাদের জীবিকা মূলতঃ কৃষিকাজ, বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হবার পরে এরা কর্মহীন বেকার জনগোষ্ঠীতে পরিণত হচ্ছে বা হবে। আংশিক পুনর্বাসনকৃত জনগোষ্ঠী'র অনেকেই তাদের প্রান্তিক নিমজ্জিত গ্রামগুলোতে ফিরে আসছে। এর কারণ হলো, যে পুনর্বাসনের জন্যে নির্ধারিত এলাকায় কৃষি-উপযোগী জমির অভাব, বিকল্প জীবিকা অর্জনে ব্যর্থতা, কমিউনিটি'র জন্যে সামাজিক বা প্রাতিষ্ঠানিক সেবার অনুপস্থিতি। Habitat International Coalition-এর দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক ব্যুরো, সরেজমিনে পুনর্বাসনের বিষয়টি তদন্তের জন্যে একটি Fact Finding Team (FFT) গঠন করে অনুসন্ধান চালায়। FFT তাদের রিপোর্টে বলছে, মধ্যপ্রদেশে স্থাপিত Rehabilitation site সমূহ উষর পাথুরে অঞ্চলে অবস্থিত যা উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর কৃষিজ ও গার্হস্থ্য জীবনের জন্যে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। বসত থেকে উচ্ছেদকৃত এই জনগোষ্ঠীর উৎপাদনশীলতা ও কর্মক্ষমতাকে নামিয়ে দেয়া হয়েছে শুন্যের কোঠায়। এর ফলে বাড়বে সামজিক অস্থিরতা, বেকারত্ব, অপরাধ ও বিশৃঙ্খলা।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নর্মদা উপত্যকার এই বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরুর পূর্বে, ভারতের সেচ, পানি, পরিবেশ কোন মন্ত্রকই একটি Comprehensive Environmental Impact Assessment (EIA) সম্পন্ন করেনি। ১৯৭৯ সালে NWDT-এর সিদ্ধান্ত ঘোষণার প্রায় আট বছর পর সর্দার সরোবর প্রজেক্ট Environmental Clearance পায়। তখনো পর্যন্ত (প্রকৃতপক্ষে এখনো পর্যন্ত) কোন প্রকার EIA করা হয়নি।

দুই।। দ্বিতীয় যে বাঁধটির কথা উল্লেখ করবো সেটি হলো মধ্যপ্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের খান্ডওয়া জেলার নর্মদানগর গ্রামে নির্মাণাধীন ইন্দিরা সাগর বাঁধ। এই প্রকল্প সমাপ্ত হলে ১.২৩ লক্ষ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আসবে। ২১৬৭.৬৭ কোটি রূপী ব্যায়ে নির্মীয়মান এই প্রকল্প তৈরী করবে ভারতের সর্ববৃহৎ জলাধার যা থেকে উৎপাদিত হবে ১০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ। ৯২মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট এই বাঁধের পানি সঞ্চালনের জন্যে নির্ধারিত Canal network তৈরী করতে প্রয়োজন পড়বে ৬১,৬২৪ বর্গ কি.মি. ভূমি।

সরকারী হিসেবেই বলা হচ্ছে প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সম্পূর্ণরূপে ডুবে যাবে ৬৯ টি গ্রাম, আংশিকভাবে নিমজ্জিত হবে ১৮৬টি গ্রাম। জলমগ্ন সর্বমোট ভূমির আয়তন হবে ৯১,৩৪৮ হেক্টর, যার প্রায় ৪৫% বনভূমি। বস্তুতঃ আংশিকভাবে ডুবে যাওয়া আর সম্পূর্ণভাবে ডুবে যাওয়া গ্রামের মধ্যে পার্থক্য খুব অল্পই। কারণ দুটোই বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। উভয় ক্ষেত্রেই মানুষ দীর্ঘদিনের গড়ে ওঠা বাস্তুসংস্থান থেকে উচ্ছেদের শিকার হয়। ১৯৮১ সালের গণনা অনুযায়ী এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ৮০,৫৭২ জন মানুষ তাদের বসত থেকে উচ্ছেদ হবে। সংখ্যাটি গত দু দশকে অনেক বেড়েছে-- সন্দেহ নেই। (সরকারী হিসেবে

তখন বলা হয়েছিলো ৩০,৭৩৯ টি পরিবার। এতগুলো পরিবারের মোট জনসংখ্যা ৮০,৫৭২ ?) একাধিক গবেষণাপত্র এই সংখ্যাটি প্রকল্প শেষ হওয়া অবধি প্রায় ০৫ লাখে দাড়াবে বলে অনুমান করছে। ১৯৮৪ সালে ইন্দিরা সাগর প্রজেক্টের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। ১৯৮৭ সালে এই প্রকল্পটিও SSP'র সাথে দিল্লী সরকারের বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় থেকে Conditional Environmental Clearance লাভ করে। ইতিমধ্যে ইন্দিরা সাগরের আংশিক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চারটি স্লুইসগেট নির্মাণ হবার পর, ২০০৩ এর নভেম্বরে একটি গেট পরীক্ষামূলক ভাবে বন্ধ করে দেয়া হয়।ফলশ্রুতিতে, অববাহিকার 'মাহেশ্বর-ওমকারেশ্বরে'র বিস্তীর্ণ জনপদে পানির অভাব দেখা দেয়। বিপুল সংখ্যাক জলজ প্রজাতির প্রাণী সহ মূল্যবান মৎস্য সম্পদ বিনষ্ট হয়। ইন্দিরা সাগর বাঁধের ভাটিতে ব্যাপক দূষণ, পানিবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। SSP'র মতো এক্ষেত্রেও উচ্ছেদ হওয়া মানুষ জীবিকা ও কর্মসংস্থানের সংকটের সম্মুখীন।

আমরা অত্যন্ত সংক্ষেপে নর্মদা উন্নয়ন প্রকল্প শুধুমাত্র দুটো বাধেঁর কথা তুলে ধরলাম। অবশিষ্ট বাঁধসমূহ নির্মিত হলে সামগ্রীক পরিবেশগত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ সহজেই অনুমেয়। দুটো দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে একাধিক সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। যেমন (১) উচ্ছেদের শিকার জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশই হচ্ছে আদিবাসী ও দলিত সম্প্রদায়। ভারতীয় সংবিধান এই জনগোষ্ঠীকে Schedule Caste বলে অভিহিত করে থাকে। এই জনগোষ্ঠী আর্থ-সামাজিক সকল দিক থেকে পিছিয়ে পড়া সুবিধা বঞ্চিত অংশ। কৃষিজ দক্ষতা ব্যাতীত জীবনধারনের অন্য কোন কৌশল এদের জানা নেই। (২) দুটো প্রকল্পের ক্ষেত্রেই ভূমি অধিগ্রহণের সময় মানবাধিকারের চরম লংঘন ঘটেছে। বিশেষতঃ আমরা এখানে ইন্দিরা সাগর প্রকল্পের কথা বলতে পারি। একটি স্বাধীন গনতদন্ত কমিশন তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করছে যে, ভূমি অধিগ্রহণের পূর্বে নির্ধারিত সময়ে eviction notice দিতে মধ্যপ্রদেশ রাজ্য সরকার ব্যার্থ হয়েছে অথবা গড়িমসি করেছে। উচ্ছেদকৃত আদিবাসীদের একটি বড় অংশ পুনর্বাসনের অংশ হিসেবে কোন ভূমি বরাদ্দ পায় নি। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিস্বত্ত্বাদের মতো এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীরও উত্তরাধিকার সূত্রে মালিকানা পরিবর্তনের রেকর্ড স্থানীয় ভূমি অফিসে আপডেট করার দৃষ্টান্ত বিরল। তহশীল রেকর্ডের ভিত্তিতে পুনর্বাসন-ভূমি বরাদ্দের কারণে অনেকেই তাদের প্রতিশ্রুত জমি পাননি। 'নর্মদা বাচাও আন্দোলন' পরিচালিত ২০০৮ সালের অগাষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসের একটি জরীপে উল্লেখ করা হয়েছে ইন্দিরা সাগর সংলগ্ন ছোট শহর 'হর্ষদ' এবং ৩১টি গ্রাম থেকে উচ্ছেদকৃত ৮২৮৫ টি পরিবার কোন প্রকার জমি পান নি। এই পরিবারগুলো থেকে অধিগৃহীত মোট ভূমির পরিমাণ ৭৪৯৯.১৯ হেক্টর। ঐ অঞ্চলে মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের গ্রামগুলো জলমগ্ন হলেও তারা কোন প্রকার ভূমি পাচ্ছেন না, অথবা পাবেন না। একই রিপোর্টে আরো বলা হচ্ছে যে, উচ্ছেদ হওয়া এই জনগোষ্ঠীর মাতর ৫.৭% বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছেন। এরকম আরো অনেক অনিয়মের কথা একাধিক গবেষণায়, সমীক্ষায় তুলে ধরা হয়েছে যা এই প্রবন্ধের মূল বিবেচ্য বিষয় নয়।

তথাপি কর্তৃপক্ষের পুলিশী কার্যক্রমের মাত্রা বোঝাতে আমরা পূর্বোল্লিখিত Habitat International Coalition'এর FFT-এর রিপোর্টে বর্ণিত একটি উচ্ছেদ ঘটনা তুলে ধরবো। মধ্যপ্রদেশের 'খেদীবালওয়ারী' গ্রামের অধিবাসীরা জানাচ্ছেন যে, ২০০২ সালের ২০ জুলাই তারিখে কয়েকশ' সশস্ত্র পুলিশ তাদের গ্রাম ঘেরাও করে। সাপ্তাহিক হাটের দিন হওয়াতে গ্রামের অধিকাংশ পুরুষ সেদিন বাড়ীতে ছিলেন না। পুলিশ বাহিনী বিনা বাক্যব্যয়ে মহিলা ও শিশুদের বলপূর্বক টেনে ট্রাকে তোলে। অনিচ্ছুক নারী ও শিশুদের উপর তারা লাঠি চার্জ করে, শারিরীক বল প্রয়োগ (লাথি) করে। নারীদের অনেকে FFT কে জানান যে, তাদের পরনের কাপড় খুলে গেলেও পুলিশবাহিনী ভ্রূক্ষেপ করেনি। 'মঙ্গলী' নামের এক নারী জানাচ্ছেন যে, তার তিন মাসের শিশুকে ঘুমে রেকে তিনি বেড়িয়েছিলেন কী ঘটছে তা দেখার জন্যে। পুলিশ তাকেও গ্রেফতার করে ট্রাকে তোলে। শত অনুনয় সত্বেও মঙ্গলী তারা সন্তানকে সাথে নেয়ার অনুমতি পায় নি। তার ১২ বছর বয়সী মেয়ে

মায়ের সাহায্যে এগিয়ে আসলে, পুলিশ তাকেও মারাত্মক প্রহার করে এবং 'গ্রেফতার' করে ট্রাকে ওঠায়। তিন মাস বয়সী কন্যাকে ফেলে মঙ্গলী ও তার মেয়েকে আরো ৭০ জন গ্রামবাসীর সাথে ৬০ কিলোমিটার দূরবর্তী 'আমখেড়া' ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্য অনেকের সাথে সশস্ত্র প্রহরাধীনে দুই দিন কাটানো পরে 'নর্মদা বাচাও আন্দোলন' কর্মীদের তৎপরতায় মঙ্গলী তার সন্তানকে ফিরে পায়। Habitat Internationation Coalition এই ঘটনাকে মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লংঘন বলে উল্লেখ করছে।

এই সব মানুষেরা সমাজের পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠী। ভারতের অর্থনীতিতে, উৎপাদনে, এদের অবদানকে খাটো করে দেখার কোন কারণ নেই। এমনকি, যদি এদের কোন প্রকার অবদান নাই থাকতো, তথাপি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তার রয়েছে বাসস্থানের, নিরাপত্তার ও প্রতিবেশের অংশ হবার। এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করার কোন অবকাশ নেই।

এটা সুস্পষ্ট ভাবে বলা প্রয়োজন যে, বাঁধ কেন্দ্রিক উন্নয়ন ভাবনা যে অসাড় তা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত। এ পর্যন্ত প্রায় সাড়ে তিন হাজার বাঁধ তৈরীর পরও ভারতে খরা ও সুপেয় পানির স্বল্পতা একটি বড় সমস্যা। বরঞ্চ দেখা যাচ্ছে যে, এই বাঁধগুলো নির্মাণের পূর্বেই সামগ্রীক অবস্থা অনেক ভালো ছিলো। অন্ধ্র প্রদেশে ১৯৫০-৫৫ সালে ১.১ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে (আবাদযোগ্য জমির ৪০%) প্রচলিত প্রাকৃতিক জলাধার থেকে সেচ দেয়া সম্ভব হতো। ঐ অঞ্চলে নির্মিত একাধিক বাঁধের কারণে এই প্রাকৃতিক পানি ব্যাবস্থাপনার ভূমিকা ক্রমশঃ গৌণ হয়েছে। এখন ২৫% জমিতে এই সেচ ব্যবস্থা কাজে লাগছে।

৬০-৭০ দশকের বাঁধ নির্মাণ ও উৎপাদন বৃদ্বির পুরকৌশলগত ধারণা থেকে পানি বিজ্ঞানীরা ক্রমেই সরে আসছেন। একাধিক দেশের বাস্তব অভিজ্ঞতা এই ধারণা পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি উদাহরণ দিতে পারি। কলোরাডো নদীতে বাঁধ দিয়ে সংলগ্ন মরু অঞ্চলে পানি সঞ্চালনের জন্যে গৃহীত প্রকল্প সমাপ্তির পর দেখা গেলো যে, কলোরাডো বেসিনে ব-দ্বীপ (Delta) আয়তন ৫% কমে গেছে। ১৯৬০ সাল থেকে রেকর্ডকৃত ডাটা বিশ্লেষনে দেখা যাচ্ছে নদীর মূল জল-প্রবাহ খুব কম সময়ই সাগর পর্যন্ত পৌছুতে পেরেছে। কার্যতঃ নদীটি তার গন্তব্যে পৌছানোর পূর্বেই শুকিয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞরা একে মৃত নদী হিসেবে গণ্য করেন। এই প্রকল্পের ফলে কলোরাডো নদী অববাহিকার কৃষিজ ফসল, উদ্ভিদ, প্রাণী ইত্যাদি গুরুতর রূপে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ব্যাপক জীববৈচিত্র্য ধ্বংসের অন্যতম কারণ হলো নদীর পানিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধি। মরু অঞ্চলে নদীর জল-প্রবাহ divert করে জমির উর্বরতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্য সফল হয়নি। উল্টো নদীর পানিই লবণাক্তত হয়ে পড়ে। প্রকল্প কতৃপক্ষ এই সমস্যার সমাধানের জন্যে ১৯৯২ সালে Arizona অঙ্গরাজ্যের Yuma-তে ২৫৬ মিলিয়ন ডলার ব্যায়ে Desalination Plant স্থাপন করে। একবছরের মাথায় ১৯৯৩ সালে এই প্লান্ট ও বন্ধ করে দিতে হয়।১৯৯৩ সালে আবারো বন্যা হয় এবং বিস্তৃত Canal Network ধ্বংস হওয়া সহ অধিক লবণাক্ততা ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রকল্পে ক্যালিফোর্ণিয়া ষ্টেটের Bureau of Reclamation লবণাক্ততা নিয়ন্ত্রনের জন্যে মোট ব্যায় করে ৬৬০ মিলিয়ন ডলার, যা পরবর্তীতে অর্থহীন বলে প্রমাণিত হয়েছে। অবশেষে, ক্যালিফোর্ণিয়া রাজ্য সরকার কলোরাডো নদী উদ্ধার ও প্রাকৃতিক ভারসাম্যের পূর্বাবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্যে ০৮ মিলিয়ন ডলারের পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

একই অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে পৃথিবীব্যাপী আরো একাধিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে। উদাহরণ হিসেবে টার্কির South Eastern Anatolia project এবং স্পেনের The spanish Hydrological Plan এর কথা বলা যায়।

ভারতীয় নদী ও পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞরা আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পের মাধ্যমে মধ্য ও উত্তর ভারতের মরুভূমিকে উর্বর করার যে দিবাস্বপ্ন দেখছেন তাদের এই দৃষ্টান্তগুলো নিয়ে আরো গবেষণা করা প্রয়োজন। আসলে এটা তাদের বুঝতে হবে যে, বাঁধ দিয়ে সেচের আওতাধীন জমি বাড়ানোর মানেই অধিক কৃষিজ উৎপাদন নয়। অধিক ও বৃহৎ সেচ অপেক্ষা উন্নত/দক্ষ সেচ ব্যবস্থার উপর গুরুত্ব আরোপ করাই লাভজনক। পরিকল্পনাবিদদের এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিগত ৫০ বছর যাবৎ বাঁধ নির্মাণের ফলে সমগ্র ভারতে বন্যাপ্রবণ এলাকা ২৫ লাখ হেক্টর থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৪০ লাখ হেক্টরে উন্নীত হয়েছে। প্রায় চার হাজার বাঁধ নির্মানের ফলে খাদ্যশষ্যের উৎপাদন বেড়েছে মাত্র ১২% -- একই সাথে ১৯৪৭ থেকে আজ অবধি ৪২ মিলিয়ন (৪কোটি ২০ লাখ) মানুষ তাদের বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদের শিকার হয়েছে। উজার হয়েছে বনভূমি, পশু-পাখীর আবাসস্থল ইত্যাদি। ভারতীয় রাষ্ট্রযন্ত্র যেন ধরেই নিয়েছে যে, উন্নয়ন মানেই হলো Mass Cultural Genocide. আজকের পৃথিবীতে বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক স্বত্ত্বার অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা যে কোন রাষ্ট্রের জন্যেই গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতীয় এই বাঁধ কেন্দ্রিক উন্নয়ন দর্শন হাজার বছর ব্যাপী দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান ধারাকে বাধাগ্রস্থ করে জনমানুষকে নির্ভরশীল করে রাখাই তার লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করছে। হাজার বছর পূর্বে মন্দিরের পুরোহিত ও সেবাইতেরা যে ভূমিকা পালন করতেন ভারতীয় রাষ্ট্রযন্ত্রের বর্তমান আধিকারিকরাও একই ভূমিকা পালন করছেন। ক্ষমতাজন্ত্রীরা প্রতিস্থাপিত হয়েছে মাত্র। সেক্যুলার ভারতের প্রতীক, জ্ঞানভারে নূব্জ্যপ্রায়, কদলীবৃক্ষসম ভারতীয় রাষ্ট্রপতি তাই প্রত্যক বছর নতুন মন্দির তথা আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প বাস্তবায়নের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করেন। মন্দিরগুলোর স্থান নিয়েছে বাঁধ। এই সত্যটি মুখ ফস্কে উচ্চারণ করেছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু। তিনি বলেছিলেন, 'বাঁধগুলো হলো স্বাধীন ভারতের মন্দির'। সত্যভাষণ বটে !

আরো একজন এই সত্যকে গভীরভাবে উপলব্দি করেছিলেন। তিনি আমাদেরই রবীন্দ্রনাথ। 'মুক্তধারা' নাটকে তিনি তুলে ধরেছিলেন শাষকে শ্রেণীর স্বরূপ, বঞ্চিত মানুষের ক্ষোভ ও হাহাকার। উত্তরকূটের যন্ত্ররাজ বিভূতি মুক্তধারার ঝর্ণায় বাঁধ দিয়ে জল আটকে দেয়। মুক্তধারার জল উত্তরকূটের অঙ্গরাজ্য শিবতরাই-এর তৃষ্ণা মেটায়। বিভূতির এই বাঁধ নির্মাণের বাহ্যিক উদ্দেশ্য প্রকৃতির উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ হলেও এর রাজনৈতিক ভিত্তি হলো তৃষ্ণার জল নিয়ন্ত্রণ করে শিবতরাই-এর আনুগত্য চিরস্থায়ী করা। নাটকটিতে দেখা যায়, শিবতরাই-এর মানুষ উত্তরকূটের শাষকদের কাছ থেকে পেয়েছে শুধু বঞ্চনা আর রূক্ষতা। দুঃখী সুবিধাবঞ্চিত মানুষ সব সময়ই ক্ষমতাহীন। গুজরাটের বাস্তুহারা কৃষকের সাথে, বাংলাদেশে ফারাক্কার কারণে কৃষিজ পেশা থেকে উচ্ছেদ হওয়া গহর আলীর কোন তফাত নেই। বস্তুতঃ তারা দুজনে একই উন্নয়ন দর্শনের শিকার। এই অবস্থার আশু পরিবর্তন প্রয়োজন।

যে কোন পরিবর্তনের জন্যে প্রথমে প্রয়োজন একটি বৌদ্ধিক/intellectual অংকুরোদগম। তার পরে প্রয়োজন বহু মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। মুক্তধারা নাটকে রবীন্দ্রনাথ এই পরিবর্তনের সূচনা দেখিয়েছেন 'ধনন্জয় বৈরাগী'র আবির্ভাবে। নাটকের শেষ অংকে যুবরাজের আত্মত্যাগে ও জনমানুষের বিদ্রোহে মুক্তধারার বাধ পরাজিত হয়। প্রাণের ধারার উচ্ছল প্রবাহ শুরু হয়। ধনন্জয় বৈরাগীর প্রতীক্ষায় থাকবো আর কতোকাল ?

মাসুক সালেহীন।
কার্বনডেল, ইলিনয়।
Salehin@hotmail.com

Reference:

1. The Impact of the 2002 Submergence on Housing and Land Rights in the Narmada Valley. Report of Fact Finding Mission to Sardar Sarovar and Man Dam Prject: South Asia Regional Programme of Habitat International Coalition, 2003. New delhi, India.
2. Without Land or Livelihood, The Indira sagar dam: State Accountability and Rehabilitation Issues. Report of the Independent People's Commission. October 2004.
3. www.narmada.org
4. www.pbs.org/wnet/wideangle/shows/dammed/debate.html